আরব বসন্ত ও আরব বিশ্ব : নয়া সংকট

মোঃ সাইফুল্লাহ*

সারসংক্ষেপ : 'আরব বসন্ত' বা 'Arab Spring'-এর অন্য নাম 'Democracy Spring'। ২০১০ সালে তিউনিশীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া আরব বসন্ত সহিংস কিংবা অহিংস উপায়ে আরব ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। আরব বসন্তের প্রভাবে বেশকিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিণাম সংঘটিত হয়। কিন্তু এসব পরিবর্তন ছিল সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী। অনেক দেশে বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবিপ্লব, সহিংসতা ও গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আরব সংঘাত নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। বিভিন্ন দেশে সরকার পতনের পর সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে মূল ধারার রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা চরমপন্থি ও অপরাধী চক্রকে ক্ষমতা চর্চার সুযোগ করে দেয়। সংখ্যালঘু খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। কুর্দি আন্দোলনে যুক্ত করে নতুন মাত্রা। আইএস মহা দানবীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আরব বিশ্ব এবং বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকটে যেমন আঞ্চলিক বলয় তৈরি হয় তেমনি আন্তর্জাতিক বলয়ও এই সংকটে সক্রিয় হয় যা Proxy Wars-এর মাধ্যমে নতুন সংকটে রূপ নেয়। বর্তমান প্রবন্ধে আরব বসন্তের স্বরূপ, আরব বিশ্বে এর প্রসারের ফলে সৃষ্ট সংঘাত, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব এবং এর মধ্য দিয়ে নানারূপী, বহুমাতৃক ও বৈচিত্রময়ী নয়া সংকটের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

'আরব বসন্ত' বা 'Arab Spring' এর অন্য নাম 'Democracy Spring'।[১] ২০১০ সালে তিউনিশীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আরব বসন্ত শুরু হয়। পরে আরব বসন্তের জোয়ার সহিংস কিংবা অহিংস উপায়ে বিপ্লব, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, দাঙ্গা, অভ্যুত্থান ও গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আরব ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। আরব বিশ্বের দেশগুলোতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসমতা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি নানা সমস্যার সমাধান ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত এসব বিপ্লব, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, দাঙ্গা ও অভ্যুত্থানকে সামগ্রিকভাবে 'আরব বসন্ত' আখ্যা দেওয়া হয়। আরব বসন্তের প্রভাবে আরব বিশ্বের বেশ কয়েকজন স্বৈর শাসকের পতন হয়, কয়েকটি দেশের সরকার উৎখাত হয় এবং নতুন সরকার গঠিত হয়। এছাড়া অনেক দেশে জনগণের অধিকার সংরক্ষিত হয়, দুর্নীতি ও বেকারত্ব দূরীকরণসহ বেশকিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিণাম সংঘটিত হয়। কিন্তু এসব পরিবর্তন ছিল সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী। অনেক দেশে বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবিপ্লব, সহিংসতা ও গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আরব সংঘাত নতুন রূপ

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিগ্রহ করে। বিভিন্ন দেশে সরকার পতনের পর সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে মূল ধারার রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা চরমপন্থি ও অপরাধী চক্রকে ক্ষমতা চর্চার সুযোগ করে দেয়। সংখ্যালঘু খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় যা দেশীয় গণ্ডি পেরিয়ে আঞ্চলিক সংঘাতে রূপ নেয়। কুর্দি আন্দোলনে যুক্ত করে নতুন মাত্রা। আইএস (ISIS) মহা দানবীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আরব বিশ্ব এবং বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকটে যেমন আঞ্চলিক বলয় তৈরি হয় তেমনি আন্তর্জাতিক বলয়ও এই সংকটে সক্রিয় হয় যা Proxy Wars-এর মাধ্যমে নতুন সংকটে রূপ নেয়। বর্তমান প্রবন্ধে আরব বসন্তের স্বরূপ, আরব বিশ্বে এর প্রসারের ফলে সৃষ্ট সংঘাত, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব এবং এর মধ্য দিয়ে নানারূপী, বহুমাতৃক ও বৈচিত্রময়ী নয়া সংকটের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

আরব বসন্তের সূত্রপাত হয় তিউনিশিয়ায়। ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর মুহাম্মদ বৌআজিজি নামক একজন ২৬ বছর বয়স্ক তিউনিশীয় তরুণ নিজ গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতি দেওয়ার প্রচেষ্টার ফল হিসেবে তিউনিশীয় বিপ্লব শুরু হয়। বৌআজিজি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একজন শিক্ষিত বেকার। অনেকের মতে, তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। কিছুতেই তিনি চাকুরি যোগাড় করতে পারেননি। ফলে জীবিকার জন্য ফুটপাতে ফলের দোকান নিয়ে বসেছিলেন। সরকারি হস্তক্ষেপে তাঁকে তাঁর দোকান থেকে উচ্ছেদ করা হয়। পৌর কর্মকর্তা কর্তৃক তিনি লাঞ্ছিত হন। অপমান সহ্য করতে না পেরে নিজ গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এবং অবশেষে ১৮ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০১১ সালের ৪ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। বিপ্লবের ২৮ দিন পর ২০১১ সালের ১৪ জানুয়ারি তিউনিশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বেন আলী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি সৌদি আরবে পলায়ন করেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর ২৩ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। পরবর্তীকালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকার এবং পরে সংসদীয় প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। তিউনিশীয় বিপ্লব এবং এর মধ্য দিয়ে স্বৈর শাসনের পতন ও গণতান্ত্রিক শাসনের উত্থান অপরাপর আরব রাষ্ট্রের নাগরিকদের উৎসাহিত করে। ফলে অতি দ্রুত অন্যান্য আরব রাষ্ট্রেও বিপ্লব শুরু হতে থাকে। এই বিপ্লব, বিক্ষোভ বা প্রতিবাদকে সামগ্রিকভাবে 'আরব বসন্ত' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বৌআজিজির আত্মহত্যার মত ছোট একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তিউনিশীয় বিপ্লব তথা আরব বসন্ত শুরু হয়। কিন্তু তাঁর এ মৃত্যু শুধু তিউনিশিয়ার নয়, বরং গোটা আরব বিশ্বের নানাবিধ সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। বৌআজিজির মৃত্যুর কারণ আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশেও প্রায় সমভাবে বিদ্যমান। আরব বসন্তের শুরু থেকে বিভিন্ন আরব দেশে সংঘটিত বিক্ষোভ-প্রতিবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আরব জনসাধারণের অসন্তোষের ক্ষেত্রগুলো প্রায় এক। আরব বসন্তের সাধারণ কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. স্থানীয় সরকারগুলোর শাসনের প্রতি জনগণের বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের অসন্তোষ প্রকাশ পায় যা জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে।

২. এসব দেশের জনগণের আয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান, অর্থনৈতিক অবক্ষয়, বেকারত্ব, অতি দারিদ্র্য, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে জন অসন্তোষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩. একনায়কতন্ত্র ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও রাজনৈতিক দুর্নীতি এসব দেশে অভ্যুত্থানের জন্য দায়ী। বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকা ও পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহের বিপ্লবের কারণ হল, সেখানে কয়েক দশক ধরে স্বৈরশাসকরা সম্পদ করায়ত্ত করার দিকে মনোযোগ দেয়। এছাড়া সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তাদের অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। যুবক সম্প্রদায় তাদের এই অপরিবর্তিত বর্তমান অবস্থা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

৪. অরব বসন্তের আর একটি কারণ হল, জনসংখ্যার কাঠামোগত সমস্যা। যেমন: শিক্ষার হার বেশি থাকা সত্ত্বেও চাকুরির সুযোগ কম, যা যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

৫. অনেক দেশের প্রতিবাদীরা 'তুর্কি মডেল' অবলম্বন করে পরিবর্তনের পন্থা অনুসরণ করে। অর্থাৎ যেখানে প্রতিবাদ হবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে, অর্থনীতি হবে দ্রুত বর্ধনশীল, সংবিধান হবে উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু সরকার হবে ইসলামি সরকার।

৬. বিভিন্ন আরব দেশে গণ-অভ্যুত্থানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহযোগিতা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যাপক অর্থায়নের অভিযোগ রয়েছে।

আরব বসন্ত বিস্তারে সবচেয়ে বেশি যে মাধ্যমটি কাজ করেছে তা হল সামাজিক গণ-মাধ্যম। যদিও ইন্টারনেট ব্যবহারের দিক থেকে বেশি (বাহরাইন = ৮৮%) অথবা কম (ইয়ামেন, লিবিয়া) উভয় ধরনের দেশে প্রতিবাদ সংঘটিত হয়। তবে লিবিয়া ছাড়া বাকি সব দেশে বিপ্লবের সময় সামাজিক গণ-মাধ্যমের ব্যবহার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ২০১১ সালের (৫ এপ্রিল) এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২ কোটি ৭৭ লক্ষ আরব ফেসবুক ব্যবহার করে (Huang, 2011)। ফেসবুক, টুইটার, সেলুলার ফোন, ব্লক, ফটো, ভিডিও, টেক্সট মেসেজ ইত্যাদির মাধ্যমে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে বলে কেউ কেউ এজন্য উত্তর আফ্রিকার আরবদেশসমূহে গণতন্ত্র উত্তরণ প্রক্রিয়াকে 'Digital Democracy' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিউনিশীয় বিপ্লবেও সামাজিক গণ-মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিপ্লবকালে মিশরের যুবকরা নিজেদের 'Facebook Generation' হিসেবে উল্লেখ করে। সামাজিক গণ-মাধ্যম বিভিন্ন দেশের পুলিশ বা সরকারের মানবতাবিরোধী অপরাধ ও হত্যাযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরে গণসচেতনতা তৈরি করে আন্দোলন বেগবান করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে সত্য, কিন্তু একই সাথে এর অপব্যবহার সামাজিক জীবনে নৈরাজ্য সৃষ্টিতেও ভূমিকা পালন করে। সামাজিক গণ-মাধ্যমে সকলের অবাধ বিচরণ থাকে বিধায় অনেক সময় গুজব, উড়ো খবর দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং সমাজের অপশক্তি চক্র এর মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। ফলে সামাজিক গণ-মাধ্যম আরব বসন্তের বিস্তারে যেমন সহায়তা করে তেমনি অপশক্তি ও অপরাধী চক্রকেও নৈরাজ্য সৃষ্টি ও ক্ষমতা অপ-চর্চার সুযোগ করে দেয়।

তিউনিশিয়া হতে শুরু হওয়া আরব বসন্ত আরব দেশসমূহে বিপ্লব, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, দাঙ্গা, অভ্যুত্থান ও গৃহযুদ্ধ আকারে ছড়িয়ে পড়ার ফলে আরব বিশ্বের পরিস্থিতি পূর্বাপেক্ষা খারাপ হতে থাকে। ফলে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের পরিবর্তে আরব বসন্ত রাষ্ট্রের ব্যর্থতায় বেশি ভূমিকা রাখে। আরব বসন্তে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়। এর ফলে তিউনিশিয়া, লিবিয়া, মিশর ও ইয়েমেনের সরকার উৎখাত হয়। লেবানন, কুয়েত, ওমান ও জর্দানসহ বেশ কয়েকটি দেশের সরকারে পরিবর্তন আনা হয়। লিবিয়া, মিশর, ইয়েমেন, সিরিয়া ও বাহরাইনে বড় ধরনের বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া ও ইয়েমেনে গণ-আন্দোলন রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে রূপ নেয় যাতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। মরক্কো, আলজেরিয়া, ফিলিস্তিন ও জর্দানে আরব বসন্তের প্রভাব কম। এসব দেশে গণ-বিক্ষোভ মোকাবেলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে ভবিষ্যতে এসব দেশেও অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে বলে ধারণা করা যায়। সৌদি আরব ও ওমানে আরব বসন্তের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী এবং সেখানে সংঘটিত বিক্ষোভ কঠোরভাবে দমন করা হয়েছে। এছাড়া সুদান, মৌরিতানিয়া ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রেও সীমিত আকারে গণ-অন্দোলন সংঘটিত হয়।

আরব বসন্তের প্রভাবে সংঘটিত বিপ্লবের পর পরিবর্তিত অবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আরব দেশে প্রতিবিপ্লবও সংঘটিত হতে দেখা যায়। কয়েকটি আরব দেশে বিপ্লবের পর পুরাতনপন্থীদের মাধ্যমে প্রতিবিপ্লব হয়েছে, আবার কিছু দেশে প্রতিবিপ্লব সাধনের চেষ্টা চলছে। মিসরে গণ-আন্দোলনে প্রেসিডেন্ট হুসনি মুবারকের পতন হয়। এরপর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম ব্রাদারহুড ও প্রেসিডেন্ট মুরসি ক্ষমতা গ্রহণ করেন। পরে মুরসির একচ্ছত্র ইসলামি শাসনের বিরুদ্ধে পাল্টা গণ-আন্দোলন শুরু হয় যার মধ্য দিয়ে মুরসির পতন ঘটে এবং আব্দুল ফাতাহ সিসি ক্ষমতা লাভ করেন। আরব জনসাধারণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ফলে বেশ কয়েকটি দেশের স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে বটে, কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। কারণ ওইসব দেশে নিরাপত্তা বাহিনী ছিল স্বেচ্ছাচারী শাসকদের আদর্শপুষ্ট যারা বছরের পর বছর ধরে তাদের রক্ষা করে এসেছে এবং প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে তারাই আবার শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। ফলে, আরব বসন্তের প্রভাবে আরব বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিপ্লবের ক্ষণস্থায়ী প্রভাব থাকলেও পাল্টা বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়া অথবা পূর্ববর্তী আদর্শে আরও শক্তভাবে বহাল থাকার ঘটনাই বেশি ঘটতে দেখা গেছে। একমাত্র তিউনিশিয়া ব্যতীত অন্যান্য আরব দেশে গৃহযুদ্ধ, বিক্ষোভ, শাসকদের পতন, সরকার পতন বা সরকার পরিবর্তন সত্ত্বেও সেখানে পুরাতন ব্যবস্থা বহাল বা পুনর্বহালের মধ্য দিয়ে কার্যত পুরাতনপন্থি বা প্রতিবিপ্লবীদেরই বিজয় হয়েছে।

আরব বসন্তের সুতিকাগার তিউনিশিয়াতেও প্রতিবিপ্লবীরা সমভাবে সক্রিয়। আরব বসন্তের ফলে কেবল তিউনিশিয়াতেই সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু আরব বসন্তের আট বছর পরেও তিউনিশিয়া নানা আর্থ-সামাজিক সমস্যায়

জর্জরিত। অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, বাণিজ্য ঘাটতি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি, বৈষম্য, বেকারত্ব ইত্যাদি নানা সমস্যার কারণে তিউনিশীয়রা আবারো রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে। সম্প্রতি (ডিসেম্বর ২০১৮) বৌআজিজির ঘটনার মত আর একটি ঘটনাও ঘটে যায় সেখানে। ক্যাসেরাইন শহরের আবদুল রাজ্জাক জরগুই নামের ৩২ বছর বয়সী একজন বেকার ফটো সাংবাদিক নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর পূর্বে ফেসবুকে দেয়া এক ভিডিওবার্তায় তিনি ক্যাসেরাইনবাসীর প্রতি সরকারের আচরণের সমালোচনা করেন। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পাশাপাশি আট বছর পরেও সেখানে গণতন্ত্র হুমকির মুখে। ওয়াশিংটনভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা 'ফ্রিডম হাউজ' সম্প্রতি সেখানকার গণতন্ত্র পেছনের দিকে চলছে জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে (Freedom House)। ফ্রিডম হাউজ ১৯৫টি দেশের ২০১৭ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনটি তৈরি করে এবং ২০১৮ সালের ১৬ জানুয়ারি প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, আবর বিশ্বের একমাত্র মুক্ত গণতন্ত্রের দেশ তিউনিশিয়া। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে সেখানেও রাজনৈতিক অধিকারের সূচক ২/৩ পয়েন্টে নেমে গেছে। পৌর নির্বাচন বারবার স্থগিত হওয়ার পর অবশেষে ২০১৮ সালের মে মাসে অবাধে পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পরও সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরোধের কারণে সেখানকার গণতন্ত্র হুমকির মুখে রয়েছে। এর ফলে রাজনীতিতে পুরোনো সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের প্রভাব জোরদার হচ্ছে যাতে সেখানে গণতন্ত্র এই পুরোনো শত্রুদের কবলে পড়তে পারে। ২০১১ সালের বিপ্লবী চেতনাকে শেষ করার একটা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে রাজনৈতিক এলিটরা (McCarthy, 2016 : 30-31)। ফলে অচিরেই আরব বসন্তের সুতিকাগার তিউনিশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে পুরাতনপন্থিদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায়না (anadoluajansi.com)।[২] অভ্যুত্থান, প্রতিবিপ্লব অথবা তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে রাজনৈতিক রদবদল হলে দেশটিতে আবারো বড় ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

আরব বসন্তের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আরব বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব নতুন মাত্রা লাভ করেছে। বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও আঞ্চলিক প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা শিয়া-সুন্নি সংঘাতে পরিণত হয়েছে। আরব বিশ্বে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব নতুন কোন ঘটনা নয়, তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই সংঘাত সৌদি আরব ও ইরানের হস্তক্ষেপের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপক মেরুকরণ ঘটিয়েছে। সিরিয়ায় শিয়া-সুন্নি সংঘাত ও ইয়েমেনের জায়েদী হাউতি শিয়াদের সাথে আল-ইসলাহ সুন্নিদের সংঘাতে সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে ব্যাপক বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং proxy যুদ্ধের মাধ্যমে উভয় দেশ সেখানে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করছে। এছাড়া লেবাননে শিয়া হেজবুল্লাহর সাথে সুন্নীদের সংঘাত চলছে। বাহরাইনে ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মদদপুষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া বিক্ষোভকারীদের সাথে সৌদি আরবের সমর্থনপুষ্ট সুন্নি শাসক বাদশাহ হামাদ বিন ইসা আল খলিফার সামরিক বাহিনীর সংঘাত চলছে। ইরাকে শিয়া-

নেতৃত্বাধীন সরকার ও শিয়া মিলিশিয়াদের সাথে সুন্নি আইএস (সালাফী/ওয়াহাবী) ও অন্য সুন্নীদের সংঘাতের কারণে সেখানে গৃহযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। আরব বিশ্বে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে গোটা আরব বিশ্বে নজিরবিহীন অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছে।

আরব বসন্তের ফলে বিভিন্ন দেশে সরকার পতনের পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূরণে যে যোগ্য, জনপ্রিয় ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য শাসক বা শাসকদলের প্রয়োজন ছিল তা যেমন তৈরি হয়নি তেমনি এ শূন্যতা পূরণে অনুকূল পরিবেশও তৈরি করা যায়নি। মূল ধারার রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা চরমপন্থি ও অপরাধী চক্রকে ক্ষমতা চর্চার সুযোগ করে দেয়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও গৃহযুদ্ধের সুযোগে আরব বিশ্ব চরমপন্থিদের প্রশিক্ষণের ভূমিতে পরিণত হয়। বিশেষ করে আইএস খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে মহা দানবীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। জর্দানের আবু মুসা আল-জারকাবি এবং পরবর্তীকালে ওসামা বিন লাদেনের হাতে আইএস-এর ভিত্তি রচিত হলেও আরব বসন্ত চলাকালে আবু বকর আল-বাগদাদীর নেতৃত্বে মধ্যপ্রাচ্যসহ সমগ্র বিশ্বে এর সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হয়।[৩] ২০১৪ সালে (জুন) ইরাকের মসুল দখলের পর আইএস নেতা আবু বকর আল-বাগদাদী খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং পৃথিবীর এ ধারার অন্য সংগঠনগুলোকে আইএস-এর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব মেনে নিতে আহবান জানান। ফলে আল-কায়েদার অনেক শাখা-প্রশাখা আইএস-এর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সালে আবু বকর আল-বাগদাদী নুসরা ফ্রন্টকে আইএসআই'র সাথে যুক্ত করে 'আইএসআইএল' বা 'আইএসআইএস' গঠন করলে নুসরা ফ্রন্টের নেতা আবু মোহাম্মদ আল-জুলানি এবং আল-কায়েদা নেতা আইমান আল-জাওয়াহিরি এই সংযুক্তিকে প্রত্যাখান করেন। আট মাসের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ২০১৮ সালে আল-কায়েদা 'আইএসআইএল' এর সাথে সকল সম্পর্কের অবসান ঘটায়। আইএস পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন পুনরুদ্ধার করতে এবং এ পথে সকল বাধা দূর করতে তাদের ভাষায় কাফির ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাকে রক্ষা করার ঘোষণা দেয়। বিশ্বাস করা হয় যে, আইএস বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী সন্ত্রাসী গ্রুপ। প্রথম দিকে এর অর্থের যোগানদাতা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ব্যক্তি ও দাতব্য সংগঠন যারা সিরিয়ার আসাদ সরকারকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। তারা তাদের অধিকৃত এলাকার খনিজ তেল বিক্রি, অপহরণ ও মুক্তিপণ লাভ, ডাকাতি, লুণ্ঠন ও জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে। এছাড়া, যারা তাদের অধিকৃত এলাকা হতে যাত্রা করে অথবা অধিকৃত এলাকায় ব্যবসা করে তাদের থেকে অর্থ আদায় করা হয়। তাদের অধিকৃত এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ জনগণের নিকট থেকেও অর্থ আদায় করা হয়। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিশেষ কর দিতে বাধ্য করা হয়। ব্যাংকে হানা, পুরাতন দ্রব্য বিক্রি, জীবজন্তু ও শস্য চুরি এবং অপহরণকৃত মহিলাদের যৌনদাসী হিসেবে বিক্রি করে আইএস অর্থ সংগ্রহ করে।

আইএস সমগ্র পৃথিবীর যোদ্ধাদের এর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয় এবং বিশ্বব্যাপী এর নেটওয়ার্ক তৈরি করে। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বিশ্বের একশটি দেশ হতে ২৫ হাজার যোদ্ধা বিভিন্ন ইসলামি গ্রুপে যোগ দেয় যাদের বেশিরভাগ আইএস ও আল-কায়েদায় যোগ দেয়। নাইজেরিয়ার বোকো হারাম, তিউনিশিয়ার আনসার আল শারিয়া, উজবেকিস্তানের ইসলামিক মুভমেন্ট ও পাকিস্তানের জুনদাল্লাহসহ তিরিশটি দেশের ষাটটি জিহাদী গ্রুপ আইএস-কে সমর্থন দেয়। আইএস মসুলে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করলেও এর সীমানা বিশ্বব্যাপী। আরব বিশ্ব ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জায়গাকে এর প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে।[৪] ২০১৪ সালের পর বিশ্বব্যাপী অসংখ্য হামলার কথা স্বীকার করেছে আইএস। বস্তুত, আরব বসন্ত পরবর্তী মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব বিশ্বের অস্থিতিশীলতা আইএসকে এসব কর্মকাণ্ডের সুযোগ করে দেয়। তারা ইসলামের অপ-ব্যাখ্যা করে অন্যান্য মুসলিম ও অমুসলিমকে আক্রমণ করা সঠিক মনে করে। তারা হত্যা, ফাঁসি এবং গণহত্যার মাধ্যমে তাদের শত্রুদের ভয় দেখাতে চায়। এভাবে আরব বসন্তের প্রভাবে সৃষ্টি হওয়া শূন্যতাকে কাজে লাগিয়ে চরমপন্থি আইএস মহা দানবীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যা শুধু আরব বিশ্বকেই নয়, বরং তা ইসলামসহ সমগ্র বিশ্বের উদারপন্থি মুসলিম ও অমুসলিমদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

আরব বসন্তের আর একটি নেতিবাচক প্রভাব হল, অমুসলিম বিশেষত খ্রিস্টান-বিরোধী চিন্তা-চেতনা বৃদ্ধি। এর ফলে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। আরব বিশ্বে স্বৈরশাসকদের পতনের পর খ্রিস্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চরমপন্থি ও অপরাধী চক্রের সহজ শিকারে পরিণত হয়। গির্জা ধ্বংস, উচ্ছেদ, অপহরণ এবং হত্যার ঘটনা ঘটানো হয়। গাদ্দাফি ও হোসনি মোবারকের মত স্বৈরশাসকদের পতনের ফলে যে শূন্যতা তৈরি হয় সেখানে ইসলামি চরমপন্থিরা ও অপরাধী চক্র সক্রিয় হয় এবং তাদের পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভবের কারণে খ্রিস্টান-মুসলিম সংঘাত বৃদ্ধি পায়। মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুড, আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট এবং সালাফীদের ক্ষমতায়নের সুযোগে চরমপন্থিদের বিস্তার সহজতর হয়। ইরাকের অংশবিশেষে আইএস-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর অনেক খ্রিস্টান তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে কুর্দি অঞ্চল ও বিদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সিরিয়ায় যুদ্ধের পূর্বে ১৮ লক্ষ খ্রিস্টান ছিল। বর্তমানে আছে ১১ লক্ষ। অর্থাৎ ৭ লক্ষ খ্রিস্টান অন্যত্র পালিয়ে যায় এবং হত্যার শিকার হয়। ২০১১ সালে গৃহযুদ্ধের আগে সিরিয়ার ৩০টি গ্রামে ১০ হাজার অ্যাশিরিয় খ্রিস্টান ও দু'ডজনের বেশি চার্চ ছিল যেখানে বর্তমানে রয়েছে মাত্র ৯০০ খ্রিস্টান এবং ১টি সক্রিয় চার্চ। এর মধ্যে কয়েকটি গ্রাম জনশূন্য, একটি গ্রামে কেবল দু'জন বসবাস করছে; মা ও তার ছেলে। এছাড়া সিরিয়ায় বসবাসকারী এক লক্ষ আর্মেনিয় খ্রিস্টানের মধ্যে এখন আছে মাত্র ৩০ হাজার, বাকিরা পালিয়ে গেছে (Arutzsheva, 2018)। খ্রিস্টান নারীরা মানব পাচারের শিকার হয়, অনেককে জোরাপূর্বক বিয়ে দেওয়া হয়, অনেককে আবার যৌনদাসীতে পরিণত করা হয়।

আরব বসন্তের ফলে সৃষ্ট অরাজকতার মূলে ইরাকের কুর্দিরা কুর্দিস্তানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আরও একধাপ অগ্রসর হয়। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকেই কুর্দিস্তান স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আসছে। এ অঞ্চলে রয়েছে ব্যাপক তেল সম্পদ এবং কুর্দিদের রয়েছে নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সংগীত, সশস্ত্র বাহিনী, সরকার ও জাতীয় সংসদ। ধারণা করা যায় যে, এ অঞ্চলটি ধীর গতিতে হলেও অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা অর্জন করতে চলেছে। ২০১৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত গণভোটে ৯০ ভাগ জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়। ইরাকের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই গণভোট প্রত্যাহারের আহবান জানায়। কুর্দিস্তান স্বাধীন হলে তুরস্ক, ইরান ও সিরিয়ার কুর্দিরা নিজেদের রক্ষার জন্য নিজেদের মধ্যে মিত্রতা তৈরি করতে পারে এবং তাদের মধ্যেও অনুরূপ স্বাধীনতার স্পৃহা জাগতে পারে। ফলে কুর্দিস্তান ও কুর্দিরা এ অঞ্চলে আরও বড় ধরনের সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

আরব বসন্তের বিস্তারের ফলে আরব বিশ্বে ইসলামপন্থি ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মধ্যে সংঘাত ব্যাপকতর রূপ লাভ করে। আরব বসন্তের পরবর্তী অবস্থা ও ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আরব বসন্ত সার্বিকভাবে কখনই ব্যাপক জনসংখ্যার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিলনা, বরং এটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ আরব শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল, ধর্মীয় ও ইসলামি সংগঠনসমূহের নেতৃত্বে প্রতিবাদী আন্দোলন (Micallef, 2018)। অন্য কথায় আরব বসন্ত ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, প্যান-আরববাদী, জাতীয়তাবাদী ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন যাতে মূলত বিভিন্ন আরব দেশের ইসলামপন্থিরা নেতৃত্ব দেয়। বিশেষত তিউনিশিয়া ও মিশরে এই দুই ধারার আদর্শ সমভাবে দৃশ্যমান যা এসব দেশে ভবিষ্যতেও দীর্ঘস্থায়ী অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে।

আরব বসন্ত শরণার্থী সমস্যা ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যার ক্ষেত্রেও ব্যাপক ছাপ রেখে যায়। আরব বসন্তের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট গৃহযুদ্ধ ও শরণার্থী সমস্যা এ অঞ্চলকে আরও অস্থিতিশীল করতে পারে। সিরিয়া যুদ্ধে সিরিয়ার মোট জনসংখ্যার (২.২ কোটি) অর্ধেক গৃহহীন হয়ে পড়ে (Aljazeera.com)। এদের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যক ইউরোপে পাড়ি জমায়। তারা সেখানে যেমন নিরাপত্তা সমস্যা তৈরি করছে তেমনি সেখানে তাদের ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। অনেকে পার্শবর্তী তুরস্ক, লেবানন, জর্ডান ও ইরাকে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া আরব বসন্ত আরব দেশগুলোরে অর্থনীতিকেও বিপর্যস্ত করে। মিসর, তিউনিশিয়া ও জর্ডানের পর্যটন শিল্প বিপর্যস্ত হয়। তেলের মূল্য কমে যাওয়ায় সৌদি আরবসহ তেল উৎপাদনকারী আরবদেশগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে যায়, অর্থনেতিক সাহায্য কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হয়, বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় এবং মানবিক বিপর্যয় ঘটে।

আরব বসন্তের ফলে সৃষ্ট সংকটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নয়া মেরুকরণ লক্ষ করা যায়। ইরান হেজবুল্লাহ ও রাশিয়ার সহযোগিতায় শিয়া-সমর্থিত আসাদ

সরকারকে রক্ষায় বদ্ধপরিকর। কারণ, "সিরীয় সরকারের পতনকে যদি আরব বসন্তের শেষ ধরা হয়, তবে এরপর ইরানি বসন্ত হতে বাধ্য (মাইমুল, ২০১৪ : ৭০)।" ফলে ইরান চাইবে যেকোনো মূল্যে আসাদ সরকারকে রক্ষা করতে। সিরীয় সংঘাতে আসাদ বিরোধীদের সহযোগিতা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সৌদি আরব, কাতার, জর্দান ও তুরস্ক। ইয়েমেন ও সিরিয়ায় শিয়াদের পক্ষ নিয়ে ইরান ও সুন্নিদের পক্ষ নিয়ে সৌদি আরবের মধ্যে স্নায়ু যুদ্ধ চলছে যা Proxy Wars-এর মাধ্যমে আপাতত নিষ্পন্ন করার চেষ্টা করা হলেও ভবিষ্যতে উভয় দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘাতের আভাস পাওয়া যায়। এই সংঘাতে সৌদি আরব তার অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক আরও জোরদার এবং ইসরাইল ঘেঁষা নীতি গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে সিরিয়া গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়া আসাদ সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র আসাদ সরকার বিরোধীদের একাংশকে সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে সেখানে তারাও Proxy যুদ্ধে যুক্ত রয়েছে। একদিকে রাশিয়া, ইরান ও তাদের সমর্থকগোষ্ঠী এবং অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা ন্যাটো শক্তি, সৌদি আরব ও তাদের সমর্থকগোষ্ঠীর এ অঞ্চলের আধিপত্য নিয়ে সংঘাত ভবিষ্যতে এ অঞ্চলকে আরও বড় ধরনের সংকটে ঠেলে দিতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক আধিপত্য এবং শিয়া-সুন্নি সংঘাত নিয়ে সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে Proxy যুদ্ধ অদূর ভবিষ্যতে সরাসরি যুদ্ধে রূপ নিতে পারে বলে ধারণা করা যায়। যদি তাই হয়, তাহলে বহিঃশক্তিগুলো আরও জোরালোভাবে স্থানীয় শক্তিগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হবে যা এ অঞ্চলকে ব্যাপকভাবে অস্থিতিশীল করে তুলবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আরব বসন্ত সমগ্র আরব বিশ্বকে আন্দোলিত করলেও এর ফলাফল সর্বক্ষেত্রে একরকম নয়। আরব বসন্ত সাময়িকভাবে কিছু ইতিবাচক ফল বয়ে নিয়ে আসলেও তা ছিল খুবই সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী এবং এর দূরবর্তী ফলাফল আরব বিশ্বের জন্য খুবই ভয়াবহ। এর ফলে সংঘটিত বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব, সহিংসতা ও গৃহযুদ্ধের মধ্যদিয়ে আরব বিশ্ব এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয় যা এর আগে প্রত্যক্ষ করা যায়নি। আরব বসন্তের ফলে কেবল তিউনিশিয়াতেই সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও আট বছর পরেও সেখানকার গণতন্ত্র হুমকির মুখে রয়েছে এবং সেখানে প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে পুরাতনপন্থিদের পুনরুত্থানের আশঙ্কা রয়েছে। আরব বসন্তের প্রভাবে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব আরব বিশ্বকে দুটো পৃথক বলয়ে বিভক্ত করার মধ্য দিয়ে নজিরবিহীন অস্থিতিশীলতা তৈরি করেছে। এর ফলে বিভিন্ন দেশে সরকার পতনের পর সৃষ্ট শূন্যতা চরমপন্থি ও অপরাধী চক্রকে ক্ষমতা চর্চার সুযোগ করে দেয় এবং আরব বিশ্ব চরমপন্থিদের প্রশিক্ষণের ভূমিতে পরিণত হয়। আইএস খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক নৃশংসতার মধ্য দিয়ে মহা দানবীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। চরমপন্থি ও অপরাধী চক্রের পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভবের কারণে খ্রিস্টান-মুসলিম সহিংসতা বৃদ্ধি

পায়। ইরাকের কুর্দিরা স্বাধিকার আদায়ে আরও একধাপ এগিয়ে যায় যা এ অঞ্চলের অস্থিতিশীলতায় আর একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। ইসলামপন্থি ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মধ্যে সংঘাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় যা এসব দেশে ভবিষ্যতে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে। শরণার্থী সমস্যা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে অরব বিশ্ব বহুমাত্রিক মহা সংকটে পতিত হয়। আরব বিশ্বের চলমান সংকট নিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নয়া মেরুকরণ ব্যাপক ও বহুমুখী সংকটের জন্ম দেয়। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা শক্তিগুলোও এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থানীয় স্বপক্ষীয় শক্তিগুলোর মাধ্যমে Proxy যুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক আধিপত্য এবং শিয়া-সুন্নি সংঘাত নিয়ে সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে Proxy যুদ্ধ অদূর ভবিষ্যতে যদি সরাসরি যুদ্ধে রূপ নেয় তাহলে বহিঃশক্তিগুলো আরও জোরালোভাবে স্থানীয় শক্তিগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হবে যা এ অঞ্চলকে ব্যাপকভাবে অস্থিতিশীল করে তুলবে। আরব বসন্তের প্রভাবে বিভিন্ন দেশে বিপ্লব, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ঘটলেও জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ করার মাধ্যমে পুরাতন ব্যবস্থা বহাল বা পুনর্বহালের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে কার্যত পুরাতনপন্থি প্রতিবিপ্লবীরাই জয়ী হয়।। তাই ফলাফল বিবেচনায় এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আরব বসন্ত যে উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছিল তা সফল হয়নি।

টীকা

১. 'Arab Spring' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বিভাগের অধ্যাপক মার্ক লিন্চ। ২০১১ সালের ৬ জানুয়ারি *Foreign Policy* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধ — "The Arab Spring : The Unfinished Revolutions of the New Middle East"-এ তিনি এ প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন।

২. তিউনিশিয়ার একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবু ইয়ারুব আল-মারজুকি ইস্তাম্বুলে তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদোলুর সাথে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রতিবিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ফ্রান্সের সহযোগিতায় প্রতিবিপ্লবীরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৩. ১৯৯৯ সালে জর্দানের আবু মুসাব আল-জারকাবি 'জামাত আল-তাওহীদ ওয়াল-জিহাদ' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০৪ সালে আল-কায়েদা নেতা উসামা বিন লাদেন এ সংগঠনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'তানজিম কাইদাত আল-জিহাদ ফি বিলাদ আল-রাফিদাইন'। তবে সাধারণভাবে এ সংগঠনটি 'Al-Qaeda in Iraq' (AQI) নামে পরিচিত। ২০০৬ সালে AQI আরও কয়েকটি সুন্নি বিদ্রোহী গ্রুপকে এর সাথে যুক্ত করে। ২০০৬ সালে জারকাবির মৃত্যুর পর আরও কতগুলো বিদ্রোহী সংগঠনকে একীভূত করে 'আদ-দৌলাহ আল-ইরাক আল-ইসলামিয়া' বা 'Islamic State of Iraq' (ISI) গঠন করে। আবু উমর আল-বাগদাদী এবং আবু আইয়ুব আল-মাসরি-এর নেতৃত্ব দেন। ২০১০ সালে তাদের

হত্যার পর আবু বকর আল-বাগদাদী এর নেতা হন। ২০১৩ সালে সিরিয়ার নুসরা ফ্রন্টকে এর সাথে যুক্ত করে ISI-এর নতুন নামকরণ করা হয় 'Islamic State of Iraq and Levant' (ISIL) বা 'Ad-Dawlah Al-Islamiyah fil Iraq wa al-Sham' (ISIS)। ২০১৪ সালে মসুলে খিলাফত ঘোষণার পর এর নামকরণ করা হয় 'Islamic State' (IS)।

৪. সিনাই প্রদেশ (মিশর), লিবিয়া, ইয়েমেন, আলজেরিয়া, খোরাসান, পশ্চিম আফ্রিকা ও ককেসাসের (চেচনিয়া ও দাগেস্তান) প্রদেশসমূহকে আইএস তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়া, সৌদি আরব, আফগানিস্তান, নাইজেরিয়া, মরক্কো, লেবানন, জর্দান, তুরস্ক, ইসরাইল, গাজা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ সমগ্র বিশ্বে এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে।

উল্লেখপঞ্জি

Carol Huang, 'Facebook and Twitter Key to Arab Spring Uprising: Report', *The National*, UAE News, 6 June 2011, *www.thenational.ae/uae/facebook-and-twitter-key-to-arab-spring-uprisings-report-1.428773*

Freedom House: Tunisia's democracy downgraded, www.aljazeera.com/news/2018/01/ freedom- house- tunisia-*democracy-downgraded-18011607191-8217.html*

Rory McCarthy, 'How Tunisia's Ennahda turned from religious opposition, From Mobilization to Counter- Revolution', *The Project on Middle East Political Science(POMEPS)*, Washington, July 26, 2016

'France, UAE support 'counter-revolution', http://anadoluajansi.com/en/europe/france-uae-support-counter- revolution-intellectual/1032777

'From 10,000 to 900 Christians: The Arab Spring,' *Arutzsheva*, 24 August 2018, *www. israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/22643*

Joseph V. Micallef, The *Arab Spring: Six Years Later*, January 29, 2018, *www. Huffington post.com/joseph-v-micallef/the-arab-spring-six-years_b_ 14461896. html*

www.aljazeera.com/indepth/interactive/2015/03/left-syria-150317133753354.html

মাইমুল আহসান খান, *বাংলার হেমন্তে আরব বসন্ত*, উত্তরণ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৪